আধুনিককালে 'বঙ্গ' নামে পরিচিত দেশটির সামগ্রিক রূপ প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে ধরা পড়ে না। তবে বিক্ষিপ্তভাবে কোনও কোনও কৌমের নাম পাওয়া যায়। এইসব কৌম বাস করত আর্য সংস্কৃতির পরিমণ্ডলের বাইরে। এরা ছিল বৈদিক আর্যদের দৃষ্টিতে 'দস্যু' বা সংস্কৃতিবিহীন। যেমন, *ঐতরেয় ব্রাহ্মণে* 'পুণ্ড্র' এবং *ঐতরেয় আরণ্যকে* 'বঙ্গ' নামে কৌমের উল্লেখ আছে। বোধায়নের *ধর্মসূত্রে* 'পুণ্ড্র' ও 'বঙ্গে'র উল্লেখ পাই। *রামায়ণের* কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে পুণ্ড্রদের উল্লেখ আছে। *মহাভারতের* সভাপর্বে ভীমের দিগ্বিজয় উপলক্ষে পুণ্ড্র, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম, প্রসুহ্ম প্রভৃতি কৌম ও জনপদের নাম পাওয়া যায়। আবার *মহাভারতের* বনপর্বে তীর্থযাত্রা অধ্যায়ে করতোয়া নদী ও গঙ্গাসাগর তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। জৈন *আচারাঙ্গ সূত্রে* লাঢ় (রাঢ়া)-দের বাসভূমিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ বজ্জভূমি বা বজ্রভূমি (রাজধানী পনিতভূমি) ও সুব্ভ (সুহ্ম) ভূমি। অনুমান করা হয়, বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলী জেলার কতকাংশ নিয়ে গঠিত মধ্যযুগের মদারন-*সরকার*-ই (*আইন-ই-আকবরী*) প্রাচীনকালের বজ্রভূমি। সুহ্মভূমি *মহাভারত* এবং *সংযুক্ত নিকায়* ও *তেল্লপত্ত জাতকে* সুহ্মজাতির উল্লেখ থেকে পরোক্ষভাবে জানা যায়। বর্তমান হুগলী জেলার এক অংশে সুহ্মদের বাস ছিল বলে মনে করা হয়। অবশ্য জৈন লেখকদের বিবরণ অনুসারে লাঢ় বা রাঢ়ার প্রধান নগরী ছিল কোটিবর্ষ (দিনাজপুর জেলার বাণগড়)। কিন্তু গুপ্ত ও পাল লেখমালা থেকে জানা যায়, কোটিবর্ষ পুণ্ড্রবর্ধন প্রদেশের অন্তঃপাতী ছিল। যাই হোক, প্রাচীন সাহিত্যে যেসব কৌম বা জনের উল্লেখ পাওয়া যায়, তারা প্রাচীন বঙ্গের বিভিন্ন জনপদের অধিবাসী ছিল বলে মনে হয়।

কৌমগুলির দ্বারা অধ্যুষিত জনপদগুলি তাদের নামানুসারে পরিচিত ছিল। যেমন, পুণ্ড্রদের বাস ছিল পুণ্ড্রবর্ধনে। *মহাভারতের* সভাপর্বে দিগ্বিজয় অধ্যায়ে পুণ্ড্রদের অবস্থান মুঙ্গেরের পূর্বে এবং তারা কোশী নদীতীরে অবস্থিত রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত। এর থেকে মনে হয়, পুণ্ড্রবর্ধন ছিল উত্তরবঙ্গে। এই তথ্য গুপ্তযুগের তাম্রশাসনাদি থেকেও জানা যায়। গুপ্তযুগে পুণ্ড্রবর্ধন নামে একটি ভুক্তি বা প্রদেশ গঠিত হয়েছিল। প্রাক্‌গুপ্তযুগে পুণ্ড্রনগর ছিল পুণ্ড্রদের শাসনকেন্দ্র। মহাস্থানগড় শিলালেখ থেকে

জানা যায়, বগুড়া জেলায় এই নগরটির অবস্থান ছিল। হিউয়েন সাঙের (সপ্তম শতক) বর্ণনা থেকেও জানা যায় পুণ্ড্রবর্ধনের কথা। পুণ্ড্রবর্ধনেরই অন্তর্গত ছিল বরেন্দ্রীমণ্ডল। গয়াড়তুঙ্গদেবের তালচের শাসনে বরেন্দ্রীর উল্লেখ আছে। সন্ধ্যাকরনন্দী তাঁর *রামচরিত* কাব্যের কবিপ্রশস্তিতে গঙ্গা-করতোয়ার মধ্যে অবস্থিত বরেন্দ্রীকে পালদের 'পিতৃভূমি' বলে উল্লেখ করেছেন। সিলিমপুর, তর্পণদিঘি ও মাধাইনগর লেখ থেকে জানা যায় যে, বরেন্দ্রী পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মিনহাজউদ্দিনের *তবকাৎ-ই-নাসিরিতে* বলা হয়েছে, *'বারিন্দ'* লখনাউতি রাজ্যের একটি অংশ ছিল, যার অবস্থিতি গঙ্গার পূর্বদিকে। এইসব সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ হয় যে, বগুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলা নিয়ে বরেন্দ্রী গঠিত হয়েছিল। বরেন্দ্রীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল শ্রাবস্তী, যার অন্তর্গত বৈগ্রাম (দিনাজপুরে হিলির নিকট), কোলঞ্চ (দিনাজপুর বা বগুড়ায়) ও তর্কারি। বরেন্দ্রীর অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবগ্রাম, বেলহিষ্টি, কান্তাপুর (দিনাজপুর জেলায় কান্তানগর), নাটারি (রাজশাহী জেলায় নাটোর) ও সম্ভবত পদুবন্বা (পাবনা)।

পুণ্ড্রের মতো বঙ্গের প্রাচীনত্ব বৈদিকযুগের, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। রাজা চন্দ্রের মেহেরাউলি লৌহস্তম্ভলেখ ও বাতাপি চালুক্যবংশের মহাকূট স্তম্ভলেখতে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাসের *রঘুবংশে* (৪র্থ সর্গ, ৩৬) 'গঙ্গাস্রোতোন্তর' বলে বঙ্গজাতির অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। গঙ্গানদীর স্রোতধারাগুলির মধ্যে অবস্থিত যে-ভূভাগ সেখানেই ছিল বঙ্গদের বাস। জৈন *প্রজ্ঞাপনায়* দাবি করা হয়েছে, তাম্রলিপ্তি (তমলুক) ছিল বঙ্গের একটি নগরী। অর্থাৎ পশ্চিমদিকে বঙ্গের সীমানা হুগলী নদী অতিক্রম করে মেদিনীপুর জেলায় কপিশা বা কাঁসাই নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু কালিদাসের কাব্যে ও জৈনগ্রন্থে বঙ্গের পশ্চিমদিকে যে-বিস্তারের ইঙ্গিত রয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। বঙ্গের অবস্থিতি ছিল গঙ্গার ব-দ্বীপের পূর্বভাগে। তার কারণ, প্রথমত ভাগীরথীর পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছিল বর্ধমান-ভুক্তি। দ্বিতীয়ত, বরাহমিহিরের *বৃহৎসংহিতা* এবং *দিগ্বিজয়প্রকাশ* (আনুমানিক ১৬০০ খ্রীঃ) থেকে 'উপবঙ্গ' নামে একটি স্বতন্ত্র জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর অন্তর্গত ছিল যশোহর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল। পালযুগের শেষপর্বে উত্তরবঙ্গ ও অনুত্তর বঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। কুমার পালের মন্ত্রী বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনে 'অনুত্তর বঙ্গে'র উল্লেখ আছে। বঙ্গ জনপদের দুটি ভাগের নামও পাওয়া যায়ঃ 'বিক্রমপুরভাগ' ও 'নাব্য'। সেনযুগে বিক্রমপুরভাগে ঢাকার বিক্রমপুর পরগনা ছাড়াও দক্ষিণে কোটালিপাড়া ও ইদিলপুর পরগনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। নাব্য উল্লেখিত হয়েছে বিশ্বরূপসেনের মধ্যপাড়া তাম্রশাসনে। লিপি প্রমাণ থেকে বোঝা যায়, বাখরগঞ্জ জেলা এবং আরও পূর্বদিকে সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল নাব্য নামে পরিচিত ছিল।

হেমচন্দ্রের *অভিধানচিন্তামণি* (দ্বাদশ শতক) ও যশোধরের *জয়মঙ্গলা* (বাৎস্যায়নকৃত কামসূত্রের ভাষ্য) থেকে জানা যায়, বঙ্গ জনপদ ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং হরিকেলি ও বঙ্গ জনপদ সমার্থক। চীনা পরিব্রাজক ইৎ-সিঙের বর্ণনায় (৭ম শতক) প্রাচ্যদেশের পূর্বসীমায় অবস্থিত ছিল হরিকেলি। নবম শতকের *কর্পূরমঞ্জরী*তে চীনা পরিব্রাজকের সমর্থন মেলে। হরিকেলির রাজার প্রধান সহায়ক ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের (বাখরগঞ্জ) শাসক ত্রৈলোক্যচন্দ্র—এই তথ্য জানা যায় পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশের লেখমালা থেকে। যাই হোক, অষ্টম শতকের *মঞ্জুশ্রীমূলকল্প* থেকে জানা যায় যে, হরিকেলি, বঙ্গ ও সমতট ছিল তিনটি স্বতন্ত্র প্রতিবেশী জনপদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত দুটি পাণ্ডুলিপির সাক্ষ্যে অনুমিত হয় যে, হরিকেলি ও শ্রীহট্ট সমার্থক।

দশম-একাদশ শতাব্দীতে ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের শাসনকর্তা ছিলেন, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এই তথ্য জানা যায় রামপাল তাম্রশাসন থেকে। ১০১৫ খ্রীস্টাব্দের একটি পাণ্ডুলিপিতে চন্দ্রদ্বীপের তারামূর্তির চিত্রায়ন আছে। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্যপরিষৎ তাম্রশাসনেও সম্ভবত চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ আছে। এরই অন্তর্গত ছিল ঘাঘর নদীর তীরবর্তী ঘাঘরকাটি (বরিশাল জেলার ঝালকাটি) গ্রাম। ঘাঘর নদীর তীরে বাখরগঞ্জের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ফুল্লশ্রী গ্রাম ছিল *মনসামঙ্গলের* কবি বিজয়গুপ্তের (পঞ্চদশ শতাব্দী) সমকালীন।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলেখে **সমতট** নামে জনপদটির উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার *বৃহৎসংহিতায়* (৬ষ্ঠ শতাব্দী) পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তক, বর্ধমান ও বঙ্গের সঙ্গে সমতটের উল্লেখ আছে। হিউয়েন সাঙের (৭ম শতক) বর্ণনায় সমতটের অবস্থান কামরূপের দক্ষিণে। ইৎ-সিঙের বিবরণ অনুসারে সপ্তম শতকে সমতটের শাসক ছিলেন রাজভট। ইনি যদি আশ্রফপুর তাম্রশাসনের রাজরাজভট্ট হন, তবে সমতটের রাজধানী কর্মান্ত, কুমিল্লার ২০ মাইল পশ্চিমে ত্রিপুরা জেলায় অবস্থিত বড়কামতা। মহীপালের বাঘাউরা মূর্তিলেখ ও দামোদরদেবের মেহার তাম্রশাসন (১২৩৪ খ্রীঃ) থেকে সমতট ও ত্রিপুরা জেলার সম্পর্ক নির্ধারিত হয়।

একাদশ শতাব্দী থেকে লেখে ও সাহিত্যে বঙ্গালদেশের নাম পাওয়া যায়। এই বঙ্গালদেশের নাম থেকেই সম্ভবত আকবরের আমলে 'বাঙলা সুবার' নামকরণ হয়েছিল। আবুল ফজলের দৃষ্টিতে বঙ্গ ও বঙ্গাল প্রায় সমার্থক। অবশ্য কয়েকটি দক্ষিণী লেখতে ও সাম্‌স্-ই-সিরাজ আফিফের *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*-তে বঙ্গাল ও বঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখিত। যদিও একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গাল-সেনা রাজশাহী জেলায় পাহাড়পুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল এবং ট্রাডিশান অনুযায়ী বঙ্গালের চন্দ্ররাজাদের

রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল পট্টিকেরা, ত্রিপুরা জেলায় মুকুল বা মেহারকুল, রঙপুর ও চট্টগ্রাম। এইসব কোনও এলাকাতেই বঙ্গালদের আদি বাসভূমি ছিল বলে মনে হয় না। মানিকচন্দ্র রাজার গানে ময়নামতী-গোপীচাঁদের কাহিনীতে আছে ঃ 'ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।' মনে হয় ভাটি ও বঙ্গালদেশ প্রায় সমার্থক ছিল। 'বঙ্গাল' শব্দটি এসেছে বঙ্গের সঙ্গে 'আল' বা 'আলি' (বাঁধ) যুক্ত হওয়ায়। প্রাচীন বঙ্গের যে-অংশটি ছিল গঙ্গা-বদ্বীপের খাড়ি সমাকীর্ণ তাকেই বলা হতো 'ভাটি'। তারনাথ গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত দ্বীপ-অঞ্চলকে 'বাটি' বলে উল্লেখ করেছেন। আবুলফজল বাঙলা সুবার পূর্বদিকের ভূভাগে 'ভাটি'কে সীমাবদ্ধ করেছেন। মনে হয় বঙ্গালদেশ অবস্থিত ছিল প্রাচীন বঙ্গের সেই অঞ্চলে, যেখানে পরিকীর্ণ ছিল খাল ও খাড়ি, বাঁধ আর সেতু। এই অঞ্চলকেই গাসটালডি (১৫৬১ খ্রীঃ) 'বেঙ্গলা' বলে অভিহিত করেছেন।

বঙ্গের মতো রাঢ়া জনপদেরও দুটি ভাগ ছিল—দক্ষিণরাঢ়া ও উত্তররাঢ়া। দশম শতাব্দীর লেখ, বাক্‌পতি মুঞ্জের গাওনরি তাম্রশাসন ও একই শতাব্দীতে রচিত শ্রীধরাচার্যের *ন্যায়কন্দলীতে* দক্ষিণ রাঢ়ার উল্লেখ আছে। একাদশ শতাব্দীর চোল লেখ, তিরুমালাই (রাজেন্দ্র চোলের) পর্বত লেখতে আমরা পাই 'তক্কনলাড়ম'। অন্যান্য যেসব সূত্র থেকে দক্ষিণরাঢ়ার উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মধ্যে রয়েছে মান্ধাতার (মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলায়) অমরেশ্বর মন্দির লেখ (হলায়ুধ দ্বারা রচিত), কৃষ্ণমিশ্রের *প্রবোধচন্দ্রোদয়* এবং মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল*। এইসব উপাদান থেকে জানা যায় হাওড়া জেলার ভুরসুট (ভূরিশ্রেষ্ঠিক), হুগলী জেলার নবগ্রাম ও বর্ধমান জেলার দামুন্যা (দামোদর নদের পশ্চিমে) দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল। এর থেকে বোঝা যায়, অজয় ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী পশ্চিমবঙ্গের এক বৃহৎ অংশ এই প্রাচীন জনপদের মধ্যে ছিল। কখনও কখনও এই জনপদের সীমা দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদ ও পশ্চিমে আরামবাগ বিভাগের অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। *দিগ্বিজয়প্রকাশে* অবশ্য রাঢ়া জনপদকে দামোদরের উত্তরেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীর ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম তাম্রশাসন (গঙ্গা সম্বৎ ৩০৮) থেকে উত্তররাঢ়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। চোল লেখে পাই 'উত্তিরলাঢ়ম্'। তাছাড়া বর্মনদের বেলাব তাম্রশাসন ও সেনযুগের নৈহাটি তাম্রশাসনে জনপদটির উল্লেখ আছে। বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসনে উত্তর রাঢ়া বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে অবশ্য জনপদটির অবস্থান ছিল কঙ্কগ্রাম-ভুক্তিতে। উত্তররাঢ়ায় অবস্থিত উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির মধ্যে সিদ্ধলগ্রাম ছিল বীরভূম জেলায় এবং বাল্লহিট্টা বা বালুটিয়া বর্ধমান জেলার উত্তর সীমায়। লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি বিভাগের গ্রামগুলি উত্তর

রাঢ়ার মধ্যে ছিল। অজয় নদকে সাধারণত উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ার সীমানা নির্দেশ করা হয়। কিন্তু কাটোয়া বিভাগের কিয়দংশ যদি উত্তর রাঢ়ার অন্তর্গত হয়ে থাকে, তবে অজয়ের বদলে খড়ি নদী ছিল উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ার সীমানা। উত্তর-রাঢ়ার উত্তর সীমা প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে জৈন *প্রজ্ঞাপনার* সাক্ষ্য যে, কোটিবর্ষ (দিনাজপুর জেলার বাণগড়) রাঢ়া জনপদের একটি নগরী ছিল। ভরত মল্লিকের *চন্দ্রপ্রভার* সাক্ষ্য থেকে মনে হয় রাঢ়ার কতকাংশ গঙ্গার উত্তরে ছিল। অবশ্য সমসাময়িক লেখমালা ও তবকাৎ-ই-*নাসিরি* থেকে জানা যায় যে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গঙ্গানদী বরেন্দ্রী ও রাঢ়ার সীমানা নির্ধারণ করত।

তাম্রলিপ্তি একটি স্বতন্ত্র জনপদ ছিল। *মহাভারতের* সভাপর্বের দিগ্বিজয় অধ্যায়ে তাম্রলিপ্তির উল্লেখ আছে। বরাহমিহিরের *বৃহৎসংহিতায়* (ষষ্ঠ শতাব্দী) পৌণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), বঙ্গ-সমতট (মধ্য ও পূর্ববঙ্গ) ও বর্ধমান থেকে তাম্রলিপ্তিক (বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অংশ) স্বতন্ত্র। অবশ্য জৈন *প্রজ্ঞাপনায়* তাম্রলিপ্তি বঙ্গ জনপদের অংশবিশেষ এবং দণ্ডীর *দশকুমার চরিতে* তাম্রলিপ্তি সুহ্মের অন্তর্ভুক্ত। *মহাভারতে* তাম্রলিপ্তিকে সুহ্ম থেকে স্বতন্ত্র করে দেখানো হয়েছে। কাজেই, অতি প্রাচীনকালে জনপদটির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও পরবর্তীকালে হয়তো তা বজায় থাকেনি। যাই হোক, তাম্রলিপ্তি জনপদটির অবস্থান ছিল মেদিনীপুর জেলায় এবং এর রাজধানী, বর্তমান তমলুক, সম্ভবত টলেমির 'ত্যামালাইটস' অথবা কারও কারও মতে *পেরিপ্লাসের* 'গঙ্গে'। হিউয়েন সাঙ (৬৩৭-৩৮ খ্রীস্টাব্দ) যখন বঙ্গদেশে ভ্রমণে আসেন, তখন তিনি তাম্রলিপ্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লক্ষ করেছিলেন। এর অবস্থান ছিল সমতট থেকে প্রায় ১৫০ মাইল দূরে।

গৌড়ের প্রাচীনতম উল্লেখ একটি নগরী হিসেবে, 'গৌড়পুর' পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ীতে* (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতক)। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতক) গৌড়ে উৎপন্ন দ্রব্যের উল্লেখ দেখা যায়, যেমন 'গুড়'। বাৎস্যায়নের *কামসূত্রে* 'গৌড়' একটি পরিচিত দেশ। মৌখরীরাজ ঈশানবর্মনের হরাহা লেখে (৫৫৪ খ্রীঃ) 'গৌড়জন' সমুদ্রের সন্নিকটের অধিবাসী। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়ের অধিপতি শশাঙ্কের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটির কাছে কর্ণসুবর্ণ।

বরাহমিহিরের *বৃহৎসংহিতায়* (ষষ্ঠ শতাব্দী) দেখা যায় 'গৌড়ক' একটি স্বতন্ত্র জনপদ। *ভবিষ্যপুরাণের* বর্ণনায় গৌড় বর্ধমানের উত্তরে ও পদ্মা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত, অর্থাৎ প্রায় খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের গৌড় কর্ণসুবর্ণ রাজ্য। মুরারির *অনর্ঘ-রাঘব* থেকে জানা যায় চম্পা ছিল গৌড়ের রাজধানী। এটি সম্ভবত *আইন-ই-আকবরীতে* উল্লেখিত মদারন-*সরকারের* চম্পানগরী, যার অবস্থান বর্ধমান শহরের উত্তর-পশ্চিমে, দামোদর নদের বামতীরে।

খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাল-সেন

লেখমালা থেকে গৌড় ও বঙ্গের একটি বিশেষ সম্পর্ক নির্ণয় করা যেতে পারে। প্রতীহার রাজ দ্বিতীয় নাগভট্টের সমসাময়িক পালবংশের রাজা ধর্মপালকে মিহিরভোজের গোয়ালিয়র প্রশস্তিতে 'বঙ্গপতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ধর্মপালের সময় থেকে পাল রাজারা 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করতেন। অবশ্য প্রথম অমোঘবর্ষের (৪৩৪-৮৭৭ খ্রীঃ) কান্‌হেরি লেখ থেকে গৌড় নামে একটি বিষয় বা জেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরই নিলগুন্দ লেখ থেকে জানা যায় যে, বঙ্গ জনপদ রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। কর্করাজের (৮১১-১২ খ্রীঃ) বরোদা তাম্রশাসনে গৌড় ও বঙ্গের পাশাপাশি উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু একই শাসক যখন 'বঙ্গপতি' ও 'গৌড়েশ্বর' রূপে স্বীকৃত হন, তখন গৌড় ও বঙ্গ রাজনৈতিক দিক থেকে সমার্থক হয়ে পড়ে। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলের একটি দলিলে শায়েস্তা খাঁ শাসিত সুবা বাঙলাকে গৌড়-মণ্ডল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গৌড়-রাঢ়ার সম্পর্ক বিষয়ে পরস্পর বিরোধী তথ্য জানা যায়। কৃষ্ণ মিশ্রের *প্রবোধচন্দ্রোদয়ে* (১১শ-১২শ শতাব্দী) বলা হয়েছে, রাঢ়া গৌড় রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু যাদব বংশের রাজা প্রথম জৈতুগির মনগোলি লেখতে রাঢ়া (লাল) গৌড় থেকে স্বতন্ত্র।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর জৈন লেখকদের বিবরণ অনুযায়ী মালদা জেলায় অবস্থিত লক্ষ্মণাবতী গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। বাৎস্যায়নের *কামসূত্রের* টীকাকার বলেছেন, গৌড় দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মধ্যযুগের *শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রে* ইঙ্গিত করা হয়েছে, গৌড় বিস্তৃত ছিল বঙ্গ থেকে ভুবনেশ (উড়িষ্যা) পর্যন্ত। কল্‌হনের *রাজতরঙ্গিণীতে* (১২শ শতক) *পঞ্চগৌড়ের* উল্লেখ পাওয়া যায়। *স্কন্দপুরাণের* সাক্ষ্য অনুসারে *পঞ্চগৌড়* বলতে বোঝায় গৌড়, সারস্বত (পূর্ব পঞ্জাব), কান্যকুব্জ (গঙ্গার দোয়াব), মিথিলা (উত্তর বিহার) এবং উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা)। অনুমান করা যেতে পারে, ধর্মপালের গৌড় সাম্রাজ্যের স্মৃতি পঞ্চগৌড়ের ধারণায় প্রতিফলিত হয়েছে।

মুসলমান শাসনের সূত্রপাতে মালদা জেলার লক্ষ্মণাবতী নগরীকে গৌড় নামে অভিহিত করা হয়। সম্ভবত এই গৌড়কে *ভবিষ্যপুরাণ* ও *ত্রিকাণ্ডশেষ* প্রভৃতি পরবর্তীকালের গ্রন্থাদিতে পুণ্ড্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।